IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

রবীন্দ্র কাব্য ও সঙ্গীতে মরমি ভাবনা

মহুয়া মারিক (Research scholar, Seacom Skills University)

Keyword :- মরমিয়া, বিশ্বাত্মাবোধ, অন্তরতম, জীবনদেবতা, সহজের সাধনা, পরমস্রষ্টা, অরূপানুভূতি, আত্মজাগরণ, অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি, সৌন্দর্যবোধ।

Abstract:- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের মধ্যে সমগ্র বিশ্বকে অনুভব করেন যখন তখনই মানবাত্মার সাথে যোগ স্থাপিত হয় বিশ্বাত্মার, কবি হয়ে ওঠেন মরমি। রবীন্দ্র কাব্যের যথার্থ উন্মেষ পর্ব 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' থেকে। সৌন্দর্য, প্রেম, স্বদেশপ্রীতি এবং বিশ্ব মানবিকতা বোধের বিচিত্র অনুভূতি যা রবীন্দ্র প্রতিভার চূড়ান্ত পর্যায়ে লক্ষ করা যায় তা 'মানসী' কাব্যে সুপ্ত অবস্থায় বর্তমান। 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থে কবির মানসসুন্দরী ও জীবনদেবতা তত্ত্ব একটি পরিপূর্ণ ঐক্যরূপ পরিগ্রহ করেছে। 'নৈবেদ্যে'র কবিতাগুলি বহিরঙ্গে অধ্যাত্মিক হলেও অন্তরঙ্গে মিস্টিক। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম ভাবনার ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা করলে 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি'র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকার করতেই হয়। সঙ্গীতনির্ভর কবির এই তিনটি সৃষ্টি পরমের সঙ্গে কবির রসলীলার আধার হয়ে উঠেছে। কবি তাঁর সৃষ্টিরাজিকে আপন আপন মূল্যের হাতে সমর্পণ করে সীমা থেকে অসীমের বুকে লীন হতে চেয়েছেন 'বলাকা' কাব্যে। 'প্রান্তিক' কবির মৃত্যুচেতনার গভীর অনুভবের কাব্য। রবীন্দ্রনাথের জীবনকালে প্রকাশিত শেষ কাব্য 'জন্মদিনে' এখানে জগৎ জীবন বিশ্ব নিয়ন্তা ও তাঁর সৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়কেন্দ্রিক দার্শনিক ভাবনা কবির লেখনীতে ধরা পড়েছে। জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার একাত্মতার কথা মরমিয়াবাদের মূলকথা, চির পুরাতন কবি নিজেকে নূতন রূপে আবিষ্কার করে সেই পরম একের লীলাসঙ্গী হতে চেয়েছেন এখানেই মরমি কবি রবীন্দ্রনাথের অসাধারণত্ব।

মূলপ্রবন্ধ -

"বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো
নয়কো বনে, নয় বিজনে,
নয়কো আমার আপন মনে,
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়

সেথায় আপন আমারো।" (৯৪ সংখ্যক কবিতা, গীতাঞ্জলি)

কবি এখানে সর্বমানবের পরম ঈশ্বরকে কামনা করেছেন- সকলের সাথে নিজেকে মিশিয়ে অহং ত্যাগ করে প্রাণের মুগ্ধতা নিয়ে তাঁর অনন্ত প্রেমের স্পর্শ পেতে চেয়েছেন। এভাবেই বিশ্বকবি যখন নিজের মধ্যে সমগ্র বিশ্বকে অনুভব করেন তখন মানবাত্মার সাথে যোগ স্থাপিত হয় বিশ্বাত্মার –কবি হয়ে ওঠেন মরমি। এই মরমি ভাবনা রবীন্দ্র সৃষ্টি-রাজিকে এক অনন্যসাধারণ মাত্রা দান করেছে।

রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয় সম্পর্কে প্রখ্যাত সমালোচক ক্ষুদিরাম দাস লিখেছেন,

"উল্লেখযোগ্য কবিদের প্রতিভায় দুটি বাহ্য উপাদান কাজ করে। একটি বহুকাল আগত অতীত আর একটি তৎকালিক বর্তমান। একটির ক্রিয়া নিগূঢ়, অন্যটির বহুল পরিমাণে প্রত্যক্ষ। কিন্তু অতীত এবং বর্তমানের দ্বন্দ্বের মধ্যেই কবিমানসের স্বরূপ প্রতিষ্ঠা অথবা আরও যৌক্তিক প্রসঙ্গ হল অতীত ও বর্তমানের সঙ্গে কবিমানসের দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ে পরস্পরের রূপান্তর। রবীন্দ্রকাব্যের উৎসমূলেও একদিকে বিপুল ভারতীয় সাহিত্য ও জীবনের ঐতিহ্যমূলক স্মৃতি রয়েছে। অন্যদিকে রয়েছে তাঁর জীবৎকালের বিচিত্র অভিঘাত। আধুনিক যুগে কোনো একটি সমগ্রদেশ ও তার অতীত, বর্তমান, এমনকি সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ নিয়ে একজন কবির রচনার রূপ পরিগ্রহ করেছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল।"[১]

১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'কবিকাহিনী' থেকে শুরু করে ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর তিরোধানের পর প্রকাশিত 'ছড়া' ও 'শেষলেখা' পর্যন্ত সামগ্রিক রচনার মধ্য দিয়ে বিরল প্রতিভাসম্পন্ন এই কবি প্রমাণ করে গেছেন যে তাঁর তুলনা তিনি নিজেই।

কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথের রচনাসম্ভার যেমন বিচিত্র তেমনি সেখানে বিধৃত হয়েছে তাঁর ভাবনার বহু বিচিত্রমুখী প্রকাশ। প্রেম-প্রকৃতি-মানুষ ও অধ্যাত্ম – এই চারটি বিষয়ই আপন আপন শিল্পসত্তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে রবীন্দ্র রচনাসম্ভারকে পূর্ণতা প্রদান করেছে।

রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে তাঁর শৈশবের কাব্যচর্চার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এইপর্যায়ে রচিত হয়, 'হিন্দুমেলার উপহার' এবং বীররসাত্মক কাহিনীকাব্য 'পৃথ্বীরাজ পরাজয়'–এ যেমন তৎকালীন জাতীয় উন্মাদনা প্রকাশিত, তেমনি কবিহৃদয়ের আবেগ ও প্রেমানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে 'বনফুল', 'কবিকাহিনী' ও 'ভগ্নহৃদয়'-এ। শেষোক্ত কাব্যত্রয়ীতে রবীন্দ্র কাব্যভাবনার বীজ নিহিত আছে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। সমালোচক তাইতো 'কবিকাহিনী' সম্পর্কে বলেছেন,

"কবিকাহিনীতে প্রকৃতিপ্রেম থেকে নারীপ্রেম এবং তার থেকে বিশ্বপ্রেমে উত্তরণের পরিকল্পনায় সঙ্গতিহীনতার চাপল্য যতই থাক, রবীন্দ্রজীবন এবং কাব্যের ইতিহাসের বিচারে এই কৈশোর কল্পনাকে নিছক কাকতালীয় বলা চলে না কিছুতেই।"[২]

রবীন্দ্র প্রতিভা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' (১৮৮২) কাব্য থেকেই। এই কাব্যগ্রন্থে বয়ঃসন্ধিকালের রোমান্টিক কবিমানসের বিরহবোধ এবং দুঃখ বিলাসের আবেগ পাঠকহৃদয়কে স্পর্শ করে যায়। কিন্তু ধীরে ধীরে এই বিষন্নতা ও নৈরাশ্যের অন্ধকার রাত থেকে প্রভাতের আলোকোজ্জ্বল জীবন উল্লাসে কবি হৃদয় জেগে উঠেছে 'প্রভাত সঙ্গীত' (১৮৮৩) কাব্যগ্রন্থে। বিষন্নতার অন্ধকার নয়, পাষাণকারার সংকীর্ণতা নয়, সমস্ত বন্ধনকে জয় করে মুক্তির অপার উল্লাসে জীবন প্রবাহে নিজেকে যুক্ত করার বাসনা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে -

"আমি ঢালিব করুণাধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণকারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া,
আকুল পাগল পারা।" (নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, প্রভাত সঙ্গীত)

জগৎকে আনন্দময় মূর্তিতে দেখা এবং প্রভাতের আনন্দস্বরূপ আলোকময় বোধে জগতের সঙ্গে নিজ ব্যক্তিসত্তাকে অঙ্গাঙ্গী জড়িত করার ইচ্ছাই 'প্রভাত সঙ্গীতের' মর্মকথা।এখানে তিনি হৃদয়-অরণ্যের সীমিত পরিসর নয় বিশ্বজগতের বিপুল ব্যাপ্তিতে নিজেকে মেলে ধরতে চেয়েছেন-

"হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি।
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।" (প্রভাত উৎসব, প্রভাত সঙ্গীত)

'ছবি ও গান' (১৮৮৪) কাব্যগ্রন্থে জগতের চিত্রময়তা এবং গীতিময়তা কবির অনুভবে ধরা পড়েছে ।'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থে জগতের রূপ ও সৌন্দর্য্যের প্রতি কবির এই মুগ্ধতাই আরো পরিণত হয়েছে -

"কত দিবসের তুমি বিরহের ব্যথা,
কত রজনীর তুমি প্রণয়ের লাজ –
সেই হাসি সেই অশ্রু সেই সব কথা
মধুর মুরতি ধরি দেখা দিল আজ।" (স্মৃতি, কড়ি ও কোমল)

কবি এখানে মানুষের দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছেন। কতশত পূর্বজন্মের স্মৃতি, সহস্র হারানো সুখ আত্মবিস্মরণের সরণী বেয়ে অনন্তকালের বক্ষে স্থান করে নিয়েছে। 'মানসী' (১৮৯০), 'সোনারতরী' (১৮৯৪), 'চিত্রা' (১৮৯৬) ও 'চৈতালী'র (১৮৯৬) যুগকে অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গত কারণেই 'ঐশ্বর্যপর্ব' নামে চিহ্নিত করেছেন। সৌন্দর্য, প্রেম, স্বদেশপ্রীতি এবং বিশ্ব মানবিকতাবোধের যে বিচিত্র অনুভূতি রবীন্দ্র প্রতিভার চূড়ান্ত পর্যায়ে লক্ষ করা যায় তাই-ই 'মানসী' কাব্যে সুপ্ত অবস্থায় বর্তমান ছিল।রোমান্টিক কবির রূপের প্রতি আকর্ষণ চিরকালীন। সেই রূপ সাধনার পথ ধরেই তিনি পৌঁছে গেছেন অরূপের কূলে, রোমান্টিক কবি হয়ে উঠেছেন মিষ্টিক –

"এ চিরজীবন তাই আর কিছু কাজ নাই

রচি শুধু অসীমের সীমা।

আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে তাহে ভালোবাসা দিয়ে

গড়ে তুলি মানসী প্রতিমা।" (উপহার,মানসী)

- এই মানসী প্রতিমা যেন আক্ষরিক অর্থেই মরমি কবির অন্তরতমা। 'মানসী' কাব্যগ্রন্থে কবি রূপদক্ষ হয়ে উঠেছেন। 'সোনারতরী' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি লক্ষ করলে দেখা যায়, বিমূর্ত সৌন্দর্য ও অধরা প্রেমের প্রতি আস্থা রেখেও রূপময় সৌন্দর্যালোক, পার্থিব প্রেম ও মর্ত্য পৃথিবীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের তীব্র মানসিক আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়েছে। 'সোনারতরী' কবিতায় এক অপরিচিতা কবির হৃদয় সৌন্দর্যের উপলব্ধি ঘটান।কবির এই চেতনার দুটি স্তর, একটি – নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য আকাঙ্খা এবং অপরটি হল বিরহ সৌন্দর্যের উপলব্ধি। এ সৌন্দর্য অধরা, অনন্ত, অসীম। সৌন্দর্যময়ীর সাক্ষাৎ পেয়েও তাদের মিলন ঘটেনি। কবির ছোট্ট তরী তারই সোনার ধানে পূর্ণ। শ্রাবণ গগন ঘিরে ঘন মেঘের আনাগোনা কিন্তু কবিকে শূন্য নদী তীরে একাকী অবস্থান করতে হয় – সৌন্দর্যকে পেয়েও তিনি হারান, তাকে ধরে রাখতে পারেন না। জীবন সম্পর্কে এক নতুন উপলব্ধিতে তিনি উন্নীত হন। এই সময় কবি যেন সুদূর অতীত থেকে অনাগত ভবিষ্যতের মধ্যে নিজের জীবনপ্রবাহকে অঙ্গীভূত করতে চেয়েছেন। সমালোচক তাই বলেছেন –

"এই কাব্য থেকেই মানসসুন্দরী ও জীবনদেবতা তত্ত্বের প্রথম পুরো রূপটি চোখে পড়ল।"[৩]

'মানসসুন্দরী' কবিতায় কবি যেন কোনো পুরাতন পৃথিবীর সৌন্দর্যচেতনায় প্রেমের ভূমিকার কথা ঘোষণা করেন। এখানে অরূপের প্রতি কবির আকুতি প্রকাশিত হয়েছে।তিনি তাকে অরূপ নয় রূপের সীমায় পেতে চেয়েছেন-

"হাসিতেছ ধীরে

চাহি মোর মুখে, ওগো রহস্যমধুরা!

কী বলিতে চাহ মোরে প্রণয়বিধুরা

সীমন্তিনী মোর, কি কথা বুঝাতে চাও।

কিছু বলে কাজ নাই - শুধু ঢেকে দাও

আমার সর্বাঙ্গ যেন তোমার অঞ্চলে,

সম্পূর্ণ হরণ করি লহ গো সবলে

আমার আমারে।" (মানস সুন্দরী, সোনারতরী)

আবার ‘পরশপাথর’ কবিতায় মানবজীবনের ট্র্যাজেডি রূপকের আড়ালে কবি ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই কবিতায় এক বিশেষ অনুভূতি রয়েছে যাকে মরমিয়া চেতনা বলা হয়, তা প্রচ্ছন্ন রূপে বর্তমান -

“নাহি যার চাল চুলা গায়ে মাখে ছাই ধূলা
কটিতে জড়ানো শুধু ধূসর কৌপীন,
ডেকে কথা কয় তারে কেহ নাই এ সংসারে,
পথের ভিখারি হতে আরো দীনহীন,
তার এত অভিমান সোনা রূপা তুচ্ছ জ্ঞান,
রাজসম্পদের লাগি নহে সে কাতর –
দশা দেখে হাসি পায় আর কিছু নাহি চায়,
একেবারে পেতে চায় পরশপাথর॥” (পরশ পাথর, সোনারতরী)

মানবমনের আকাঙ্খাকে সসীম জগতের উর্দ্ধে অসীমের অভিমুখে চালিত করে যে বোধ সেটাই মরমি ভাবনাজাত। চেতন মনের সীমা থেকে অবচেতন মনের গহনে পরমকাঙ্খিতের সন্ধান মরমি হৃদয়ের বৈশিষ্ট্য।

কবির অপরিসীম সৌন্দর্য দৃষ্টি গভীর ভাবসম্পদ নিয়ে ‘চিত্রা’ (১৮৯৬) কাব্যগ্রন্থে প্রকাশ পেল। ‘চিত্রা’ রোমান্টিক কাব্য কিন্তু এখানে কবি রোমান্টিকতার স্তর অতিক্রম করে মরমি অনুভবের গভীর প্রদেশে উপনীত হয়েছেন। চেতন-অচেতন, চেনা-অচেনা, জানা-অজানার সীমা পেরিয়ে অধরা মাধুরী তার অস্তিত্ব যেন জানান দিয়ে যায়।রহস্যময়তার বিপরীত প্রদেশে বুঝি তার অবস্থান। মরমি কবি সেই রহস্যের আবরণ ভেদ করতে উন্মুখ –

“ওই হেরো সীমাহারা গগনেতে গ্রহতারা
অসংখ্য জগৎ,
ওরই মাঝে পরিভ্রান্ত হয়তো সে একা পান্থ
খুঁজিতেছে পথ।
ওই দূর দূরান্তরে অজ্ঞাত ভুবন পরে
কভু কোনোখানে।

আর কিগো হবে দেখা আর কিসে কথা কবে

কেহ নাহি জানে।" (মৃত্যুর পরে, চিত্রা)

'চিত্রা' রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে পরিণত মনের কাব্য, এখানে মানসসুন্দরী ও জীবনদেবতা তত্ত্ব একটি পরিপূর্ণ ঐক্য লাভ করেছে।এখানে কবি তাঁর অন্তর্সত্তা সম্পর্কে আপন উপলব্ধি ব্যক্ত করেছেন –

"অন্তর মাঝে বসি অহরহ

মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ.

মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ

মিশায়ে আপন সুরে।

কী বলিতে চাই সব ভুলে যাই,

তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,

সংগীত স্রোতে কূল নাহি পাই,

কোথা ভেসে যাই দূরে।" (অন্তর্যামী, চিত্রা)

- এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সমালোচকের মন্তব্যটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ –

"চিত্রাকাব্যের একদিকে সৌন্দর্য উপলব্ধির পূর্ণতা, আর একদিকে জীবনবোধের ফলে মর্ত্য উপলব্ধির পূর্ণতা, এই উভয়বিধ মনোভাবের বিকাশের সঙ্গে কাব্যরচনাগত একটি পূর্ণতার বোধ ও অজ্ঞাতসারে মিশ্রিত হয়ে কবিকে এই সময়ে এমন একটি উপলব্ধিতে নিয়ে গেছে যা এই পর্যায়ে কবির আত্মসর্বস্ব অনুভূতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হয়েছে। এই উপলব্ধির বস্তুকে কবি জীবনদেবতা নাম দিয়েছেন।" [৪]

জীবনদেবতার স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে কবি বলেছে –

"যে শক্তি আমার জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখকে, সমস্ত ঘটনাকে ঐক্য তাৎপর্য দান করিতেছে, আমার রূপান্তর, জন্মজন্মান্তরকে একসূত্রে গাঁথিতেছে, যাহার মধ্য দিয়া বিশ্ব চরাচরের মধ্যে ঐক্য অনুভব করিতেছি, তাহাকেই জীবনদেবতা নাম দিয়াছিলাম... নিজের জীবনের মধ্যে এই আবির্ভাবকে অনুভব করা গেছে–যে আর্বিভাব অতীতের মধ্য হইতে অনাগতের মধ্যে প্রাণের পালের

উপর প্রেমের হাওয়া লাগাইয়া আমাকে মহাকাল নদীর নূতন নূতন ঘাটে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছেন, সেই জীবনদেবতার কথা বলিলাম।"[৫]

কবির 'অন্তরতম' হল ভিতরের 'আমি', এই ভিতরের 'আমি' বাইরের 'আমি'কে পরিচালিত করে। বাইরের 'আমি'র কাছে সেই ভিতরের'আমি' বুদ্ধির আগোচর। একে নিজের অর্ধচেতন মনের ইচ্ছার ফলশ্রুতি বলা যায়। কবির মরমি চেতনার প্রকাশ এখানেই।

'ক্ষণিকা'(১৯০০) কাব্যগ্রন্থে কবির গভীর অনুভবের অভিব্যক্তি সহজ সুরে ধরা পড়েছে। নব প্রাণশক্তির অকারণ পুলকে কবিহৃদয় জেগে উঠেছে। এই অহেতুক আনন্দ, জীবনের সহজ প্রকাশ মরমিয়া ভাবনাজাত। এই আনন্দ, এই মুক্তি মরমিয়ার জীবনপথের পাথেয় –

"শুধু অকারণ পুলকে
নদী জলে পড়া আলোর মতন ছুটে যা ঝলকে ঝলকে।
ধরণীর পরে শিথিল বাঁধন
ঝলমল প্রাণ করিস যাপন,
ছুঁয়ে থেকে দুলে শিশির যেমন শিরীষ ফুলের অলকে।
মর্মরতানে ভরে ওঠ গানে শুধু অকারণ পুলকে।" (উদ্বোধন, ক্ষণিকা)

'নৈবেদ্য' (১৯০২) কাব্যগ্রন্থের বেশীরভাগ কবিতারই মূলসুর প্রার্থনা বিষয়ক। –সর্বত্র বিরাজিত চির বিচিত্র আনন্দস্বরূপ জীবননাথকে সাধনার পরমধন জ্ঞানে সতত স্মরণ করতে চেয়েছেন তিনি। ভারতীয় সাধনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সহজ সরল জীবনযাপন। এই সহজ সাধনার স্পর্শেই 'নৈবেদ্য'র কবিতাগুলি সমৃদ্ধ। আর এই সরলতাই মিষ্টিসিজমের প্রাণ।মরমিয়া কবি কন্ঠে তাইতো ধ্বনিত হয় সর্বত্র বিরাজিত পরমেশ্বরের মহিমাকীর্তন -

"সব দুঃখে, সব সুখে, সব ঘরে ঘরে,
সব চিত্তে সব চিন্তা সব চেষ্টা 'পরে
যত দূর দৃষ্টি যায় শুধু যায় দেখা,
হে সঙ্গবিহীন দেব, তুমি বসি একা।" (জনারণ্য, নৈবেদ্য)

'স্মরণ' (১৯০২) কাব্যগ্রন্থে পরলোকগতা পত্নী মৃণালিনী দেবীর মর্মস্পর্শী স্মৃতিচারণ স্থান পেয়েছে। বিচ্ছেদবেদনার নিবিড় বন্ধনে কবির মিলন সম্পূর্ণ হয়েছে–

"মিলন সম্পূর্ণ আজি হল তোমা-সনে
এ বিচ্ছেদ বেদনার নিবিড় বন্ধনে।

এসেছ একান্ত কাছে ছাড়ি দেশকাল
হৃদয় মিশায়ে গেছ ভাঙি অন্তরাল।" (স্মরণ, স্মরণ কাব্য)

- এ শুধু রোমান্টিকতা নয়; শব্দের বন্ধনে অনুভব আরো বেশী কিছু বলে।এই বেশীটাই মিষ্টিকতা।

পরবর্তী 'উৎসর্গ' (১৯১৪) কাব্যগ্রন্থটিকে 'নৈবেদ্য'র অনুসারী বলা যায়। কবির অন্তরতমের অস্তিত্ব এখানে নিখিল বিশ্বব্যাপী। তাই তিনি চির অধরা, চির অচেনা। এই প্রিয়তম কিন্তু কোনো আধ্যাত্মিক ধারণাজাত নয়। কবি আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তাঁকে সৃজন করেছেন। এই কাব্যগ্রন্থ তাই আধ্যাত্মিক চেতনায় আবদ্ধ নয়; মরমি ভাবনায় উন্মুক্ত –

"ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা,
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।" (আবর্তন, উৎসর্গ)

এরপরেই এসেছে রবীন্দ্রকাব্যে পালাবদলের কাল। সেই পালাবদলের সংকেতবাহী হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে 'খেয়া' (১৯১০) কাব্যগ্রন্থ। 'খেয়া' যেন পার্থিব জগৎ থেকে অধ্যাত্ম জগৎ অভিমুখে কবিমানসকে চালিত করেছে। এখানে রূপজগৎ ও অরূপজগতের মধ্যে যেন এক সংযোগ সেতু রচিত হয়েছে। 'খেয়া' শব্দটির মধ্যে একটি গতির অনুষঙ্গ বর্তমান। নদীর স্রোতের মতো সময় ও জীবন বয়ে চলে। মায়াময় পৃথিবীর ঘাটের কিনারায় কবি বেলাশেষের শেষ খেয়ার জন্য অপেক্ষারত। অসীম লীলাময়ের উদ্দেশ্যে তিনি পাড়ি জমাতে চেয়েছেন -

''ঘরেই যারা যাবার তারা কখন গেছে ঘরপানে,
পারে যারা যাবার গেছে পারে,
ঘরেও নহে, পারেও নহে, যেজন আছে মাঝখানে
সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে।....
ওরে আয়
আমায় নিয়ে যাবি কে রে

বেলাশেষের শেষ খেয়ায়।'' (শেষখেয়া, খেয়া)

'খেয়া' কাব্যগ্রন্থে কবির ভগবৎ অনুভূতি নূতন রূপে প্রকাশ পেয়েছে। এখানে কবি আগের থেকে অনেক বেশী মরমি হয়ে উঠেছেন। অসীম অরূপ লীলাচ্ছলে নানারূপে কবিহৃদয়কে স্পর্শ করেছে, পরিণাম স্বরূপ কবি হৃদয়ে নানা রসের উৎসের উদ্বোধন ঘটেছে। এই অনুভবকেই কবি অরূপানুভূতি বলেছেন।

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম ভাবনার ইতিবৃত্তকে যদি পর্যালোচনা করা যায় তাহলে 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০), 'গীতিমাল্য' (১৯১৪), 'গীতালি'র (১৯১৪) ভূমিকাই যে সর্বাধিক সে কথা স্বীকার করে নিতেই হয়। সঙ্গীতনির্ভর এই তিনটি সৃষ্টি পরমের সঙ্গে কবির রসলীলার আধার হয়ে উঠেছে। এখানে ভাব-ভাষা ও সুরের ত্রিবেণী সঙ্গম সাধিত হয়েছে। সাধকরা মনে করেন, সংগীতই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে মানুষের শ্রেষ্ঠ নিবেদন। কারণ সুরের পরিধি অসীম অপার। কোনো তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে তার ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। 'গীতাঞ্জলি' জীবনদেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত রবীন্দ্রনাথের হৃদয় উজাড় করা অঞ্জলি। এর বহুগান মরমিয়া সাধনার ইঙ্গিতবাহী। 'গীতাঞ্জলি'র একটি গানে কবিকে বলতে শুনি -

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ ধূলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে"। (১ সংখ্যক গান, গীতাঞ্জলি)

চোখের জলে সকল অহংকারকে ডুবিয়ে দিতে চেয়েছেন কবি।

জীবনকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে হলে দুঃখের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। মানব জীবনে দুঃখের আঘাত মানুষকে সত্য উপলব্ধির সামনাসামনি দাঁড় করিয়ে দেয়। দুঃখের পর দুঃখ পেতে পেতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুঃখ ঘুচেছে। একের পর এক প্রিয়জনকে হারাবার দুঃখের মধ্য দিয়ে কবি পরম সত্যের উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছেন। তাঁর মধ্যে জন্ম নিয়েছে এক দ্বান্দ্বিক দর্শন। তাইতো তিনি সহজেই বলতে পারেন -

"আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ – দহন লাগে,
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে"।(২৭ সংখ্যক গান, স্বরবিতান)

রবীন্দ্রনাথ সাধক কবি। তাঁর বিশ্বাস মনুষ্যকুল একই স্রষ্টার সৃষ্টি। তাই মানবসমাজে ভেদাভেদ নিষ্প্রয়োজন। কারণ কৃত্রিম ভেদাভেদের অর্থ ঈশ্বর থেকে বঞ্চিত হওয়া। কবি নিখিল মানবের মধ্যে নরদেবতাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। কবির এই মানবপ্রীতি তাঁর অরূপ অনুভূতির দ্বারা গভীরভাবে সিক্ত। অরূপ

বোধের সাথে মিশ্রিত এই উদার মানবপ্রীতি, দুঃখ ও মৃত্যুকে অস্বীকার করে এক নব জীবনবোধে কবিকে উন্নীত করেছে-

"এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমান ভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থ নীরে –
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।" (ভারততীর্থ, গীতাঞ্জলি)

রবীন্দ্রনাথের এই অপূর্ব গীতিকাব্যে শুধু নিবিড় মানবানুরাগ কিংবা ভাগবত অনুভূতিই নয় নিসর্গানুভূতির প্রকাশও বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় -

"এসো হে এসো, সজল ঘন,
বাদল বরিষনে
বিপুল তব শ্যামল স্নেহে
এসো হে এ জীবনে"। (২০ সংখ্যক গান, গীতাঞ্জলি)

অলংকারহীন ভাষায় কবির ভক্তি নম্র আবেদন গানগুলিকে এক অন্য মাত্রা দান করেছে। শ্রেয় ও প্রেয় মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে এখানে। অহং এর আবরণ ছিন্ন করে প্রাণের মুগ্ধতা নিয়ে নিরবধি তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে প্রাণ চায় কিন্তু বিরহের পরপারে তার বাস –

"যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু
এবার এ জীবনে
তবে তোমায় আমি পাইনি যেন
সে কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে।"
(২৪ সংখ্যক গান, গীতাঞ্জলি)

'গীতাঞ্জলি'র ভক্তিভাবের সাথে গীতিকবিতার লিরিক সুরের এক আশ্চর্য মিলন সম্ভবপর হয়েছে বিশ্বকবির প্রতিভাস্পর্শে। যা শুধু অনুভববেদ্য, তাকে ব্যাখ্যা করতে গেলে সেই নিবিড় অনুভূতির গভীরতা নষ্ট হয়।

ব্যক্তিজীবনের বহু আঘাতে ব্যথিত কবি গানের ভেতর দিয়ে নিজে যে অপূর্ব ভুবন দেখতে পেয়েছেন এবং সেখানে যে পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ করেছেন অনুভবশীল পাঠকের কাছে তা তিনি উপস্থাপন করেছেন সংহত বাণীরূপে- এখানেই তাঁর কৃতিত্ব।

'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি' প্রকৃতপক্ষে একটিই কাব্য, বক্তব্য ও শৈলীতে এদের কোন প্রভেদ নেই। 'কল্পনা', 'নৈবেদ্য' ও 'খেয়া'তে যে জীবনবোধের তথা অধ্যাত্ম চেতনার সঞ্চার হয়েছিল তাই 'গীতাঞ্জলি'র মধ্য দিয়ে 'গীতিমাল্য', 'গীতালি'তে পরিপূর্ণরূপে বর্তমান। একথা স্বীকার করতেই হয় যে, 'গীতাঞ্জলি'র ঈশ্বর উপলব্ধি 'গীতিমাল্যে' আরো সহজ, আরো নিবিড় হয়ে উঠেছে।'গীতিমাল্যে'র প্রধান বৈশিষ্ট্য এর সারল্য। রবীন্দ্রনাথের সাধনা সারল্যের সাধনা। এই সাধনায় তিনি কোনো প্রথাগত পন্থা অনুসরণ করেননি। কৃচ্ছসাধন, যোগসাধনা কিংবা বৈরাগ্য কোনোটাই কবিকে বেঁধে রাখেনি। পথই তাকে আপন পথে পরিচালিত করেছে। তাঁর এই সাধনপথে কাউকে তিনি গুরুর আসনে বসাননি কারণ তিনি মরমিয়া। প্রকৃত মরমিয়া যিনি তার কোনো প্রথাবদ্ধতা থাকে না, তিনি সহজের সাধক। 'গীতিমাল্যে' তাইতো কবিকে বলতে শুনি -

"ওদের কথায় ধাঁদা লাগে, তোমার কথা আমি বুঝি।
তোমার আকাশ তোমার বাতাস এই তো সবই সোজাসুজি।
হৃদয় কুসুম আপনি ফোটে জীবন আমার ভরে ওঠে –
দুয়ার খুলে তাকিয়ে দেখি হাতের কাছে সকল পুঁজি।"

(নিঃসংশয়, গীতিমাল্য)

রবীন্দ্রনাথের সুগভীর ঈশ্বরোপলব্ধি এভাবেই 'গীতিমাল্যে'র গানগুলিকে স্পর্শ করে আছে –

"মনে হল আকাশ যেন
কইল কথা কানে কানে।
মনে হল সকল দেহ
পূর্ণ হল গানে গানে। (৩৫ সংখ্যক গান, গীতিমাল্য)

কবির সাধনাবিহীন তৃপ্তি, পরমপ্রাপ্তি, নিরবচ্ছিন্ন শান্তি, স্নিগ্ধ সরলতা ও সুগভীর মাধুর্যবোধ 'গীতিমাল্য'কে এক পরিপূর্ণ সার্থক সৃষ্টিতে পরিণত করেছে।

'বলাকা' কবির নবজীবনবাদের বাণীতে স্বয়ংসম্পূর্ণ এক কাব্য। এই কাব্যে কবি যেমন যৌবনের জয়গান গেয়েছেন তেমনি গতিতত্ত্বের কথাও এসেছে তবে এর অন্তর্লীন সুর কিন্তু অধ্যাত্মিক সুর। যা কবির অরূপ অনুভূতি প্রাণিত জীবনবাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। এখানে তিনি বিশ্বের রূপরসে বিশ্বেশ্বরকে অনুভব করেননি, কবি তাঁর একান্ত নিজস্ব রূপরসে তাঁকে অনুভব করেছেন।

'পুনশ্চ' (১৯৩৩), 'শেষ স্তবক' (১৯৩৫) এবং 'পত্রপুট' (১৯৩৬) কাব্য তিনটি গদ্যছন্দের একই সুরে বাঁধা। কবির মরমি ভাবনা কাব্যত্রয়ীতে নিঃশব্দে প্রবহমান ধলেশ্বরীর মত –

"এ গান যেখানে সত্য
অনন্ত গোধূলি লগ্নে
সেইখানে
বহি চলে ধলেশ্বরী।
তীরে তমালের ঘন ছায়া –
আঙিনাতে
যে আছে অপেক্ষা করে, তার
পরণে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।"
(বাঁশি, পুনশ্চ)

এখানে শব্দের সরণি বেয়ে মিষ্টিকতা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো নিঃশব্দে বয়ে চলে। এখানে আনন্দ বেদনা একাকার হয়ে গেছে। অনন্ত গোধূলিলগ্নে বয়ে চলা ধলেশ্বরীর তীরে তমালের ঘন ছায়া ঘেরা আঙিনায় চির অপেক্ষমানার জন্য ঘরের দুয়ার বন্ধ হলেও কবি মনের দুয়ার খুলে রেখেছেন, যেখানে তার অবাধ যাতায়াত।

কবি জীবনের 'গোধূলি পর্যায়ের কাব্যগ্রন্থগুলি হল 'প্রান্তিক' (১৯৩৮), 'সেঁজুতি' (১৯৩৮), 'আকাশ প্রদীপ' (১৯৩৯), 'নবজাতক' (১৯৪০), 'সানাই' (১৯৪০), 'রোগশয্যায়' (১৯৪০), 'আরোগ্য' (১৯৪৯), 'জন্মদিনে' (১৯৪১), 'শেষলেখা' (১৯৪৯)। জীবনের গোধূলীলগ্নের কবিতাগুলির মধ্যে মৃত্যুচেতনার গভীর মনস্তাত্ত্বিক দর্শন, জগৎ ও জীবনের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা প্রদর্শন, জীবনের প্রকৃত অর্থ অনুসন্ধানের স্পৃহা একই আধারে প্রকাশিত। অনিবার্য মৃত্যুকে মেনে নিয়ে কবি এক নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন যেখানে আত্মা অবিনশ্বর, মৃত্যু নবজীবনের প্রবেশ দ্বার। তাঁর কাব্যের ভিতর কবি তাই বাস্তবে মায়ায় মিশিয়ে এক অনবদ্য চিত্রকল্প রচনায় ব্রতী হয়েছেন –

"যেথা তব রথ

শেষ চিহ্ন রেখে যায় অন্তিম ধূলায়

সেথায় রচিতে দাও আমার জগৎ।

অল্প কিছু আলো থাক্

অল্প কিছু ছায়া

আর কিছু মায়া।" (৪ সংখ্যক কবিতা, রোগশয্যায়)

জীবনের অন্তিম লগ্নে মর্ত্যলোক কবির আরো মধুর মনে হয়েছে। পৃথিবীর প্রতি ধূলিকণা পবিত্র ও মধুময় হয়ে দেখা দিয়েছে কবিদৃষ্টিতে –

"এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধুলি

অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি

এই মহামন্ত্রখানি

চরিতার্থ জীবনের বাণী"। (মধুময় পৃথিবীর ধূলি, আরোগ্য)

রবীন্দ্রনাথের জীবনকালে প্রকাশিত শেষকাব্য 'জন্মদিনে' জগৎ জীবন, বিশ্বনিয়ন্তা ও তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে দার্শনিক ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে। এরপর 'শেষলেখা' কাব্যগ্রন্থের সর্বশেষ কবিতাটিতে তার দীর্ঘ জীবনের চরম তথা পরম উপলব্ধিটি বিধৃত হয়েছে। জীবন ও সৃষ্টি যেমন তাঁর কাছে সত্য, মৃত্যুও তাঁর কাছে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে।

কাব্য রচনা ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় বিভিন্নরূপে অধ্যাত্ম্য ভাবনার জগতে তিনি বিচরণ করেছেন। কখনো অরূপকে রূপের মাঝারে ধরার, সীমাকে অসীমের গভীরে পাওয়ার প্রতীক্ষা, না পাওয়ার অনুতাপ, পেয়েও হারানোর বিরহবোধ, কখনো আবার প্রিয়রসঙ্গের সঙ্গে একাত্মবোধ - এ সবই মরমি প্রবণতার এক একটি বিশিষ্ট দিক।

জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার একাত্মতার কথা মরমিয়াবাদের মূলকথা। মরমিয়া সাহিত্যে পরমপুরুষের সঙ্গে সাধকের চরম মিলনই উক্ত সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করেছে। বাউলরা যেমন আত্মানুসন্ধানের মধ্য দিয়ে মনের মানুষকেই খুঁজেছেন, সুফিরা যেমন সাধনমার্গের শীর্ষে পৌঁছে পরমকে পেতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর ভাব - সাধনার চরম স্তরে অরূপের সঙ্গে অনন্ত মিলন কামনা করেছেন –

"তাই তোমার আনন্দ আমার পর

তুমি তাই এসেছ নিচে।

আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,

তোমার প্রেম হতো যে মিছে"। (১২১ সংখ্যক গান, গীতাঞ্জলি)

কবি হৃদয়ে বিচিত্ররূপ ধরে পরম ঈশ্বরের ইচ্ছাই এভাবে তরঙ্গিত হয়েছে।

তাই সবশেষে এসে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ বাস্তবিকই একজন মরমিয়া শিল্পী। যদিও তিনি সাধনার নির্দিষ্ট কোন গণ্ডি মেনে সাধনা করেননি। আক্ষরিক অর্থে তাই তিনি সাধক নন। কিন্তু কাব্যসাধনার একটি নির্দিষ্ট পর্বে অধ্যাত্ম্য ভাবনার জগতে অধ্যাত্ম্য উপলব্ধির চরম পর্যায়ে তিনি উপনীত হয়েছিলেন। অরূপের রূপের লীলায় তিনি আপন হৃদয়কে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর সান্নিধ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা কবি হৃদয়কে ব্যাকুল করেছিল। সেইহেতু দীর্ঘ প্রতীক্ষা, ত্যাগের সাধনা, বাসনা নিবৃত্তির সংযম, প্রেমাস্পদকে বিচিত্র রূপে পাবার লীলাময় অনুভূতি, সর্বোপরি সেই পরম লীলাময়ের সঙ্গে কবিকাঙ্ক্ষিত বিচিত্র মিলনলীলা -- এ সবই মরমিয়াবাদের মূল সুর যা মরমি রবি কবির হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অনুরণন তুলেছিল, আর এখানেই তিনি অনন্যসাধারণ।

তথ্যসূত্রনির্দেশ :-

১) দাস ক্ষুদিরাম, *রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়*,পৃষ্ঠা ১

২) চৌধুরী ভূদেব, *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা,* চতুর্থ পর্যায়, (রবীন্দ্র যুগ, দ্বিতীয় পর্ব), পৃষ্ঠা ৬৫

৩) বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত কুমার, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত,* পৃষ্ঠা ৪৭৩

৪) দাস ক্ষুদিরাম, *রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়*,পৃষ্ঠা ৮৯

৫) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, আত্মপরিচয়, পৃষ্ঠা ২

গ্রন্থপঞ্জি

১) চক্রবর্তী, অজিতকুমার : রবীন্দ্রনাথ ও কাব্য পরিক্রমা (মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৮৮)

৩) চৌধুরী ভূদেব : বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, চতুর্থ পর্যায় (রবীন্দ্রযুগ : দ্বিতীয় পর্ব, দেব পাবলিসিং, কলকাতা, জানুয়ারী, ১৯৯৪)

৪) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : আত্মপরিচয় (বিশ্বভারতী, কলকাতা, চৈত্র, ১৪০০)

৫) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : জীবনস্মৃতি (বিশ্বভারতী, কলকাতা, চৈত্র, ১৩৯৮)

৬) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : খেয়া, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৫ম খন্ড (বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৌষ ১৪১৭)

৭) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : গীতবিতান (সাহিত্যম্, কলকাতা, ১৫ই শ্রাবণ, ১৪১৫)

৮) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : গীতাঞ্জলি, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৬ষ্ঠ খন্ড (বিশ্বভারতী, পৌষ, ১৪১৭)

৯) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৩য় খন্ড, (বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৌষ ১৪১৭)

১০) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : মানুষের ধর্ম, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খন্ড (বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৌষ ১৪১৭)

১১) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : বলাকা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৬ষ্ঠ খন্ড – ঐ

১২) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : সংগীত চিন্তা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ষোড়শ খন্ড

১৩) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ : শান্তিনিকেতন, ১ম খন্ড (বিশ্বভারতী, পৌষ, ১৩৯৯ কলকাতা)

১৪) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ : সংগীত চিন্তা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ষোড়শ খন্ড, (বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৌষ ১৪১৭)

১৫) দে, সুকুমার : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (আনন্দ, কলকাতা, ১৯৯৬)

১৬) দাস, ক্ষুদিরাম : রবীন্দ্র – প্রতিভার পরিচয় (পুঁথিঘর, কলকাতা – ৬, ১৯৬০)

১৭) বিশী, প্রমথনাথ : রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ (মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৮৯)

১৮) বসু, শুদ্ধসত্ত্ব : রবীন্দ্রকাব্যে গোধূলি পর্যায় (মন্ডল বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৯৯)

১৯) ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ : রবীন্দ্র – কাব্য – পরিক্রমা (ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, মাঘ ১৪০৬)

২০)ভট্টাচার্য, জগদীশ : কবি মানসী, দ্বিতীয় খন্ড, (কাব্যভাষা, কলকাতা, ভারবি, মাঘ ১৪০৬)